ছাত্র আন্দোলনের আগামী দিন

আলী রীয়াজ

স্বত্ব
লেখকের

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৮৩

প্রকাশক
অনুপম
১/১, জোড়পুল লেন
টিপু সুলতান রোড
ঢাকা—১

মুদ্রণ
এহতেশামুল হায়দার জিন্নাহ
একতা প্রিন্টার্স

মূল্য
তিন টাকা

লেখকের অন্যান্য বই
বাঙালী জাতীয়তাবাদ (১৯৭৯)
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্য (১৯৮৩)

[এক]

ভূমিকা

সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের আন্দোলন এক বছর অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের এ যাবতকালের দীর্ঘতম সময়কালব্যাপী এই ছাত্র আন্দোলন বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্তর পরম্পরাক্রমে এক ধাপের থেকে অন্য ধাপে প্রবেশ করেছে। ডাকসু ও অন্য দুটি নির্বাচিত ছাত্র সংসদ সহ ১৭টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে রাজনৈতিক দল সমূহের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঐক্য মোর্চা—১৫, ৭ ও ১০ দলীয়—জনগণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং নিজস্ব 'অভিন্ন ঐক্য দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে নিজেদের বক্তব্য—আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের 'দৃঢ় অঙ্গীকারের' ঘোষণা বারংবার তুলে ধরছেন। একদিকে ছাত্র সমাজের একক ঐক্যজোট [যদিও একটি উল্লেখযোগ্য ছাত্র সংগঠন এই ঐক্য জোটের বাইরে অবস্থান করছেন] এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর তিনটি ঐক্য মোর্চা গড়ে উঠেছে—এরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিকশিত হয়েছে ১১টি শ্রমিক সংগঠন ও ১০টি কৃষক সংগঠনের দুটি ঐক্য জোট, যা প্রকৃতপক্ষে আপাতঃ মিত্রীয় ঐক্য মোর্চা মাত্র। বাংলাদেশের ইতিহাসের এ যাবতকালের বিরলতম এই ঐক্য প্রচেষ্টার সূচনাকারী শক্তি (Initiating force) যে ছাত্র আন্দোলন তা বছরাধিক কালব্যাপী লাগাতারভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সজীব ও প্রাণবন্ত থাকলেও বাস্তবতঃ রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য প্রচেষ্টা ও তাদের কর্মসূচীতে একটা 'টিমে তেতলা, ধীরে চলো' নীতি ভূমিকা নয়। আজকের মুহূর্তে এই ছাত্র আন্দোলনের স্বরূপ-অন্বেষা ও তার চূড়ান্ত পরিণতি প্রশ্নে সজাগতা তৈরীর জন্যে সচেষ্ট হলে, এই বিষয়গুলো অবশ্য-অবশ্যই গোড়াতেই উল্লেখ করে নেয়া দরকার হবে। সামগ্রিকভাবে আজকে

যে রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান এবং ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত আন্দোলনের পথরেখা কোন্ সম্ভাবনার (আশংকার?) ইঙ্গিত দিচ্ছে ছাত্র আন্দোলনের প্রাণিত তরুণ কর্মীদের সে বিষয়ে এখনি ধারণা নেয়া দরকার, এবং তাকে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা দরকার, অথবা ইতিমধ্যেই সে পথে পরিচালিত হতে থাকলে সে ধারাকে পরিপুষ্ট, বেগবান ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা দরকার।

এটা এই মুহূর্তে, অর্থাৎ অক্টোবরের এই প্রথম সপ্তাহের দিনগুলোতে, কারোই বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, আগামী মাসগুলোতে বর্তমান আন্দোলন আরেকটি নতুন ধাপে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং সেই ধাপে প্রবেশের প্রস্তুতি-পর্বটি অংশতঃ সম্পন্ন হয়েছে ও অংশতঃ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও চালিকা-শক্তি ছাত্র কর্মীদের নিষ্ঠার সাথে ভেবে দেখা দরকার যে আদৌ এই পথে তারা ছাত্র আন্দোলনের পরিণতির কথা ভেবেছিলেন কিনা, ভাবছেন কিনা, ভাবা যৌক্তিক কিনা। সেই বিষয়ে ভাববার জন্যে দরকার এই আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক বিভাজন ও তার মূল্যায়ন। সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরে যে সব সংগঠন আছেন এবং যারা বাইরে আছেন—কি রাজনৈতিক শক্তি, কি তথাকথিত সাধারণ মানুষ—ইতিমধ্যেই সাধারণার্থে এক বছরের এই আন্দোলনকে, তার ঘটনাস্রোতের গুরুত্বের বিচারে, কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং তার মূল্যায়ন খাড়া করেছেন। লক্ষণ হিসেবে এটি নিশ্চয়ই শুভ। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রমের সাথে সাথে তার প্রাতিভাসিক সত্য (apparent truth) এবং মর্মবস্তুর (essence) মূল্যায়ণ ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ আন্দোলনের গতিকে বাস্তব ও সাফল্যমুখী করে, আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মপন্থাকে সহজতর করে। অন্যদিকে আন্দোলন সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি জনগণকে আরো বেশী রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সত্য আরো বেশী গুরুত্ববহ। আন্দোলনের একেকটি পর্যায়ে আন্দোলন সম্পর্কে জোটভুক্ত দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রকাশ

জোটের ভেতরে মতবাদিক সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করে এবং জনগণের সামনে আলাদা আলাদা রাজনৈতিক দলের চরিত্র উন্মোচন করে।

আমরা বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের ভবিষ্যত-বিচারের প্রেক্ষাপট হিসেবে এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও ত্রুটি, আন্দোলনের বিভিন্নমুখী মূল্যায়ণের নিরীক্ষা, পারপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political development) তুলে ধরবো এবং আমাদের ধারণা এই সমস্ত কিছুই বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আন্দোলনের ভবিষ্যত পদরেখাকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাসী, বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী মার্কসবাদীদের সাহায্য করবে। আমরা এও মনে করি যে, আমাদের এই সার্বিক নিরীক্ষা এই আন্দোলনের বৃহত্তর রূপ রচনায় নিবেদিত ছাত্র কর্মীদেরকে ভবিষ্যতের করণীয় নির্দেশে সহায়ক হবে।

[দুই]

আন্দোলনের ধারাক্রম

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনকে পরিচালনা ও তার দূর-লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছাত্র সংগঠনগুলোর যে মেরুকরণ ঘটছিলো সামরিক আইন জারীর পর তার কার্যকারিতা অবসিত হয়ে যায় এবং সামরিক আইনের জবরদস্তি শাসনের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে ছাত্র সংগঠনগুলো নতুনতর ভাবে ঐক্য ও আন্দোলনের ভাবনায় নিমগ্ন হন। এ প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা, সাংগঠনিক পর্যায়েই, এপ্রিল মাসে সূচনা করা হয়। এই আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতটি ছিলো দেশের ওপর চেপে বসা সামরিক শাসন।

সাথে সাথে একথাটিও আমাদের পুনর্বার স্মরন করা আবশ্যক যে, ২৪শে মার্চ, ৮২-তে যখন সামরিক শাসন চেপে বসে তখন কি পরিস্থিতিতে তা আবির্ভূত হয়ে ছিলো। সে সময়ে স্পষ্টতঃ তিনটি আপাতঃ কারণ জনগণের সামনে সামরিক আইন জারির কারণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো। প্রথমতঃ সমাজের সর্বস্তরস্পর্শী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট। দ্বিতীয়তঃ গতানুগতিক বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং জনগনের সঠিক আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থতার ফলে সমগ্র রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের ওপর জনগণের প্রচণ্ড অনাস্থা (বলা বাহুল্য, সঠিক বিপ্লবী দলের দুর্বল অবস্থানের কারণে জনগণ এ সব দলের বিকল্প বিবেচনায় ছিলো অপারগ); তৃতীয়তঃ ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীন কোন্দলের তীব্রতার প্রকাশ্য রূপ লাভ ও শাসনকার্য পরিচালনায় তাদের সামগ্রিক ব্যর্থতা। এই তিনটি আপাতঃ কারণকে পুঁজি করে ক্ষমতায় আসীন হয় সামরিক বাহিনী এবং এই ক্ষমতা-হরণকে 'যৌক্তিক' করে তোলার জন্যে ক্যু-দতার পূর্ব থেকেই পত্র পত্রিকায়

সামরিক বাহিনীর প্রধান বিবৃতি প্রদান ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা করতে থাকে। পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসীন হয়ে রাজনৈতিক দল সমূহের বিরুদ্ধে ঢালাও ভাবে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে, রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র হনন করে জনগনের নেতিবাচক সমর্থন আদায়ে ব্যাপৃত হয়। সামরিক বাহিনী তাদের এই ক্ষমতা গ্রহণকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারী দল আশ্রিত ও অন্যান্য কুখ্যাত সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন, জনগণের সামাজিক আকাঙ্খা ও সিপাহীদের অগ্রসর মানসিকতার সাথে সংগতিপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ নিপীড়ন থেকে বিরত থাকা, বর্তমান অসার সমাজ ব্যবস্থাকে সচল করতে কিছু কিছু সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপ নেয়।

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের পেছনে এই আপাতঃ কারণগুলো যাই হোক না কেনো প্রকৃত কারণ ছিলো ভিন্ন। আমাদের মতো অনুন্নত ও পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশে সামরিক আইনের পৌনঃপুনিক প্রত্যাবর্তনের যে অনিবার্য কারণ এ ক্ষেত্রেও তাই ছিলো ক্ষমতা গ্রহনের মৌল সত্য। আমরা জানি যে, পুঁজিবাদের তৃতীয় সাধারণ সংকটকালে অনুন্নত দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা জনগনের জন্যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানেও বৃষ্ঠিত। তারা অবাধ গণতন্ত্রের নামে চালু বুর্জেয়া গণতন্ত্র তথা জনগনের ন্যূনতম গণতন্ত্র বলে কথিত বাক-ব্যক্তি সংগঠনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকারকেও যতদূর সম্ভব সীমিত করতে চায়। এতে করে বুর্জোয়াদের শাসনে, বর্তমান অবস্থায়, গণতন্ত্র মানেই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। পুঁজিবাদের উত্থানের যুগে যে বুর্জোয়ারা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মহান পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে ছিলো; ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষনের জন্যে ব্যক্তির পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলো; রাষ্ট্রনীতিতে প্রশাসন, আইন ও বিচার —এই তিন প্রত্যঙ্গে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্যের নীতির কথা বলেছিলো, তারাই আজকের দিনে পার্লামেন্টের মাধ্যমে বহুদলীয়

গণতন্ত্রের মোড়কে কায়েম করছে 'সংবিধানসম্মত একনায়কত্ব' কিংবা এক দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে জারী করছে এক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ শাসন। এই দুই পথই বুর্জোয়াদের অভ্যন্তরীন সংকট, ক্ষমতা এককেন্দ্রীকরনের লোলুপ বাসনা এবং ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার প্রয়াসেরই প্রতিভূ। এ সব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দল যখন জনগনের ভেতরে অধিকার সচেতনতা তৈরী করে আন্দোলনের উদ্যোগ নেয় কিংবা বুর্জোয়াদের অভ্যন্তরীন সংকট যখন এতই তীব্র হয়ে উঠে যে সংবিধানসম্মত একনায়কত্বও আর নিজেদের ভাগ-বাটোয়ারার দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করতে পারে না তখন ক্ষমতায় আবির্ভূত হয় বুর্জোয়াদের শেষ সংগঠিত শক্তি সামরিক বাহিনী—দেশে জারী হয় সামরিক আইন। এ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আমাদের দেশের পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সকল আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা, সংকট, বন্ধ্যাত্ব ও জটিলতার কারণ এবং বিরাজমান পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোকে শোষক শ্রেণীর স্বার্থে টিকিয়ে রাখার জন্যেই সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে। যে আপাতঃ তিনটি কারণকে পুঁজি করে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল করেছে তারও মৌলসূত্র এবং অন্তর্নিহিত কারণ পুঁজিবাদী সমাজের নিজস্ব ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও অনিবার্য পরিণতি। আর সে কারণেই ক্ষমতা গ্রহণের পর জনগণের সামনে এই সামরিক সরকার যত চোখ ধাধানো সংস্কার কর্মসূচীই হাজির করুন না কেনো সংকটের অতলে নিমজ্জিত পুঁজিবাদী কাঠামোকে তারা চাঙ্গা করতে পারেনি।

ক্ষমতা গ্রহণের পর আপাতঃভাবে জনগণের মধ্যে 'দেখা যাক' ভাব তৈরীতেও এই সরকারের ব্যর্থতার কারণ জনজীবনে অর্থনৈতিক সংকট লাঘবের পরিবর্তে বৃদ্ধি, বিভিন্ন কল-কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের সূত্রে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনে হস্তক্ষেপ এবং স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধুয়া তুলে ও সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক পদ দখলের ফলে বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে বিরোধ

সহ এ ধরনের ঘটনাবলী। ফলে দিন দিনই সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জনজীবনে ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটেই সামরিক আইন জারির কিছুকাল না যেতেই ছাত্র সমাজের ভেতরে সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলনের চেতনা ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। আর তারই পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে নেয়া হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-প্রয়াসী উদ্যোগ, যা পরবর্তী বৎসরাধিক কাল যাবত লাগাতারভাবে এগিয়ে চলেছে।

আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই আমরা গত এক বছরের ঘটনাক্রমকে মোটারেখায় ভাগ করবো। ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলনমুখী উদ্যোগ এপ্রিল/মে-তে শুরু হলেও তা সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাপক ছাত্রদের সামনে হাজির হয়েছে বলে আমাদের ঘটনাক্রমের হিসেব সেখান থেকেই শুরু হবে। সেপ্টেম্বর থেকে ১১ই জানুয়ারীর ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাস্রোতকে 'প্রস্তুতিপর্ব' বলে আমরা চিহ্নিত করেছি। ১১ই জানুয়ারীর ঘটনাকে 'আন্দোলনের শিক্ষা-পর্ব' হিসেবে আমরা দেখতে চাই। তারপরেই মধ্য-ফেব্রুয়ারী রক্তক্ষয়ী বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৪/১৫ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর ২৬শে মার্চ ঘোষিত হয় ১০ দফা কর্মসূচী এবং আন্দোলন বৃহত্তর পরিসর অভিমুখী হয়। সবশেষে ২রা অক্টোবর ছাত্র মহা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে। বিভিন্ন দিবস পালনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি সচেতন থেকেও আমরা দিবসওয়ারী তালিকা প্রদানের চেষ্টা করিনি বরং তার চেয়ে সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের ধারাক্রমটি হাজির করার চেষ্টা করেছি।

বাষট্টি সালের শিক্ষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী 'শিক্ষা দিবস' ১৭ই সেপ্টেম্বর পালন উপলক্ষে একটি নীরব মিছিলের আয়োজন হয় ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—একদিকে শিক্ষার লড়াইয়ে আত্মদানকারী বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং অন্যদিকে সামরিক আইনের প্রতি ছাত্র সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচনই যে এই মিছিলের উদ্দেশ্য ছিলো তা বলাই বাহুল্য। এই দিন রাতেই শিক্ষা

দিবসের পোষ্টার লাগাতে গিয়ে গ্রেফতার হন তিনজন ছাত্র কর্মী। ১৬ সেপ্টেম্বরের এই মিছিল ও শিক্ষা দিবস পালনে এই যৌথ উদ্যোগ ছিলো মূলতঃ প্রস্তুতিবিহীন ও সামরিক আইনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদের প্রতীকী প্রকাশ (Token protest)। আর তাই তিনজন ছাত্র কর্মীর গ্রেফতার ও তাদের দণ্ড দান সত্ত্বেও এই গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলো তৎক্ষণাৎ (instantly) কোনো প্রতিবাদ জ্ঞাপন পর্যন্ত করতে পারেনি এবং সত্যি করে বললে সাধারণ ছাত্রদের সামনে সে মুহূর্তেই এ ঘটনাকে গুরুত্ববহ করে তুলতে পারেনি। এ ঘটনার সপ্তাহ না পেরুতেই, ২৩শে সেপ্টেম্বর ৮২-৮৭ সালের জন্যে সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রী জনাব মজিদ খান একটি শিক্ষানীতির প্রস্তাব হাজির করেন। এর প্রধান দিক সমূহের মধ্যে ছিলো :

১) ১ম শ্রেণী থেকে আরবী এবং ২য় শ্রেণী থেকে ইংরেজী এই দুটো বিদেশী ভাষা সহ মোট তিনটি ভাষা শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়েই বাধ্যতামূলক করা ;

২) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে আরো ২ বছর বাড়ানো ;

৩) মাধ্যমিক শিক্ষার পর স্নাতক শিক্ষার পূর্বে আরেকটি প্রাক-স্নাতক পর্ব প্রবর্তন ;

৪) উচ্চ শিক্ষাকে অত্যন্ত সীমিত ও বাছাইকৃত করা।

প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতির মূল বিষয়কে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ এর কাঠামোগত দিক এবং দ্বিতীয়তঃ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগত বা উপাদান গত দিক। কাঠামোগত দিক-হচ্ছে জোর করে তিনটি ভাষা চাপানো, শিক্ষার সময়কে প্রলম্বিত করা প্রভৃতি। উদ্দেশ্যগত দিকের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকারকে মুষ্টিমেয় ধনবানের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসা, শ্রেণী বৈষম্যকে আড়াল করবার জন্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা পরিপুষ্ট করা। নিঃসন্দেহে একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তবে অতিরিক্ত ভাষা চাপানো বা শিক্ষার সময়কে প্রলম্বিত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষাঙ্গন থেকে শিক্ষার্থীদের তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য যত না

প্রকটিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষভাবে তা প্রকাশিত হয়েছে যখন নগ্নভাবে শিক্ষা সংকোচনের জন্যে এই বক্তব্য হাজির করা হচ্ছে যে, the post secondary education would be highly selective and free in order of merit or on minimum 50 percent cost basis.

সামরিক সরকারের এই শিক্ষানীতিতে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বীজ শিশু মনের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া ও তা লালন-পালনের যে চেষ্টা তার মৌল কারণ এই যে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ যাতে পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বকে অনুধাবন ক'রে, এই দ্বন্দ্বে তার অবস্থানকে চিহ্নিত করে সত্য সন্ধানে ব্রতী ও সত্য সাধনায় সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারে তা নিশ্চিত করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মানুষের মধ্যে মৌলিকতাকে উজ্জীবিত করা এবং পারমার্থিক মুক্তির স্বপ্ন-কল্পনা-মোহ মুক্ত হয়ে ইহলৌকিক ও বস্তুবাদী ধারনায় সজ্জিত হওয়া তাকে আড়াল করবার জন্যেই এই সাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারের ষড়যন্ত্র। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, শিক্ষার পরিধিকে মুষ্টিমেয় ধনবান মানুষের আয়ত্বের মধ্যে রেখে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কারণ আজকের দিনে বুর্জোয়া শাসকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের আঙ্গিনায় পৌছুতে দিতে নারাজ। পুঁজিবাদের বিকাশ কালে, পুঁজিবাদ যেহেতু আধুনিক কৃৎ-কৌশলের উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছিলো সেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলো। কিন্তু যেহেতু এই পুঁজিবাদ আজ জ্বরাগ্রস্থ এবং রুদ্ধ সেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বিকাশমান ধারাকে সর্বস্তরগামী করার ক্ষেত্রে আর ভূমিকা রাখতে পারে না। বরং নিজ শোষনের স্বার্থে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের সাথে আপোষরফার মাধ্যমে টিকে থাকতে চায়। আর সে কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগত ও কাঠামোগত উভয় দিককেই ক্রমান্বয়ে জটিল, সাম্প্রদায়িক ও অবৈজ্ঞানিক রূপ দেয়া হচ্ছে। এই যে সামগ্রিক উদ্দেশ্যগত দিকটি তুলে ধরা হলো তা যে কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের বর্তমান প্রতিভু সামরিক সরকারের শিক্ষানীতিতেই প্রতি-

ফলিত হয়েছে তা নয় পূর্বের অন্যান্য বেসামরিক বুর্জোয়াদের শিক্ষা-নীতিতে, এমনকি পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনামলের শিক্ষানীতিতেও স্পষ্ট। ১৯৫৯ সালের শরীফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে 'শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়।' হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবীকে বলা হয়েছিলো—'অযৌক্তিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অবাস্তব দাবী'। ১৯৭২ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পর্কে বলছে, 'এর ব্যয় শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র বেতন হতে আদায় করা হোক এবং অন্যান্য উৎস থেকে যা পাওয়া যাবে তা সহ সরকার বাকী ৫০ ভাগ বহন করুক।' (লক্ষ্যনীয়, বর্তমান সরকারের ৫০ ভাগ তত্ত্বের সাথে এই বক্তব্যের মিল কত গভীর।)

সামরিক সরকারের এই শিক্ষানীতি ঘোষনার পর পরই বিভিন্ন মহল থেকে শিক্ষানীতির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এই নীতি প্রত্যাহার ও সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও ৫ ও ২০শে অক্টোবর পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে এই আবেদন পেশ করা হয়। এরপর এই বিষয়ে প্রচার আন্দোলন ধরনে সারা দেশে ছাত্রছাত্রীদের সই সংগ্রহ অভিযান শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে।

কিন্তু ৮ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে একটি ছাত্র সংগঠনের মিছিলের ওপর পুলিশের বর্বর হামলা এবং সাধারণ ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ঘটনার মোড় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ছাত্রসংঠনগুলোর প্রচার আন্দোলনে সাধারণ ছাত্ররা যতদূর না আন্দোলনমুখী হচ্ছিলেন তার চেয়ে বেশী আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠেন এই হামলার পর। ৯ই নভেম্বর ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও ১৪ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্লাশ বর্জনে আন্দোলন জঙ্গী ভাব নিয়ে আসে। ১৪ই নভেম্বরের সমাবেশে ২১ তারিখ পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী ঘোষণার কথা বলা হয় এবং ২১শে নভেম্বর

মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকসু ও ১৪টি ছাত্র সংগঠনের ঐক্য মোর্চা 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

এখানে আন্দোলনের কয়েকটি দুর্বলতার দিক উল্লেখ করা দরকার। ২১শে নভেম্বরের এই সাংবাদিক সম্মেলনের আগে পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর ঐক্য মোর্চার পক্ষ থেকে যে বক্তব্য দেয়া হচ্ছিলো তাতে শিক্ষানীতি বাতিলের দাবী প্রাধান্য লাভ করলেও তা যে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা জোরদারভাবে উপস্থাপিত হচ্ছিলো না। একইভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত ৩ জন ছাত্রের মুক্তির দাবীও অনেকটা অপ্রধান সুরেই বলা হচ্ছিলো। তা ছাড়া মোর্চা গঠনের পেছনে কর্মসূচীগত ঐক্যবোধ দূরের কথা ইস্যুগুলোও খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিলো না—একমাত্র শিক্ষানীতি বাতিলের বিষয়টি ছাড়া। দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হলো, সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকায় ছাত্র সংগঠনগুলো একত্রে মোর্চাবদ্ধ হয়ে কাজ করলেও ঢাকা শহরের বাইরে, সারা দেশে, ছাত্র সংগঠনগুলোর এতদিনকার পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদকে সরিয়ে একসাথে কাজ করবার মতো মানসিকতা তখনও গড়ে উঠেনি—সে রকম কোনো উদ্যোগও লক্ষ্য করা যায়নি। তৃতীয়তঃ পরিষদ তার আনুষ্ঠানিক অস্তিত্বের ঘোষণা দিলেও তার কোনো সাংগঠনিক কাঠামো নিজেরাও দাঁড় করতে পারেনি।

এ সব সত্ত্বেও ২১শে নভেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ৩জন ছাত্রের মুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে যা থেকে এটা অন্ততঃ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচেষ্টা ও ৩জন বন্দী ছাত্রের মুক্তির দাবীতে পরিষদ আন্দোলন রচনায় ব্রতী হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ২৯শে নভেম্বর দাবী দিবসের কর্মসূচীও ঘোষিত হয়। দাবী দিবসে ১৩ই ডিসেম্বর সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও বটতলায় সমাবেশ এবং ঐ সমাবেশ থেকে ১১ই জানুয়ারী 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভিমুখে শান্তিপূর্ণ দাবী মিছিলের' কর্মসূচী দেয়া হয়।

এখানে আবার আমরা আন্দোলনের আরো কয়েকটি দিনের প্রতি নজর দিতে পারি। যে সময় অত্যন্ত আলোর বিষয় ছিলো এই সে, আন্দোলনকে সযত্ন লালনের মধ্য দিয়ে বিকশিত করার ক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিষদের আন্তরিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি ছাত্র সমাজের ব্যাপক উৎসাহ ও অংশগ্রহণ। ১৪ই ডিসেম্বরের ধর্মঘটের কর্মসূচীর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার বাইরে ৪টি বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়া পরিষদ নেতৃবৃন্দ আর কোথাওই যায়নি, সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে দেশের কোথাওই পরিষদের শাখা দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি তবুও কেন্দ্রের ঘোষণা শুনে সাধারণ ছাত্ররাই কর্মসূচী সফল করে তুলছিলেন। আরো আশার বিষয় ছিলো এই যে ইতিমধ্যেই —অতিক্রান্ত তিন মাসের সালতামাসী করে—এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছাত্র সংগঠনগুলোর কারো কারো মধ্যে এই আন্দোলনের দূর লক্ষ্যকে আরো বেশী সামনে তুলে আনার প্রয়াসে নিবদ্ধ হতে দেখা গেছে। এই চেতনাবোধ আন্দোলনের মধ্যে প্রসারিত হতে শুরু করেছিলো যে, ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের গড়ে তোলা এই আন্দোলন শেষাবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এ বিষয়ে সচেতন জিজ্ঞাসা থাকা দরকার। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে বিশ্বাসী ছাত্র কর্মীরা এই বোধ ও অনুভূতি অর্জন করতে শুরু করেছিলেন যে, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করা সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। কারণ সামরিক সরকারের সংকুচিত, সাম্প্রদায়িক ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলানর মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজসহ জনগণের ভেতরে সার্বজনীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতির উন্নততর ধারণা গড়ে উঠবে এবং সরকারের নতুন শিক্ষানীতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর দিনগুলো উন্মোচিত হবে। এর ফলে বুর্জোয়া শাসন ও তার বিকৃত রূপ যে ফ্যাসিবাদ তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যে ভাবাদর্শগত জমিন তা হবে দুর্বল, বিপরীতক্রমে বিকশিত হবে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ। পুঁজিবাদী শাসনকে পরাস্থ করতে ফ্যাসিবাদের ভাবাদর্শগত জমিন দুর্বল করা এবং গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মান

অপরিহার্য শর্ত। এই আন্দোলনের মধ্য অর্জিত অভিজ্ঞতা ছাত্র সমাজ ও জনগণকে সমস্যার মূল প্রকৃতি সম্পর্কে যেনো সচেতন করে তুলতে পারে সে বিষয়ে ছাত্র কর্মীদের অনেকেই নিবেদিত। ছাত্র ও জনগণের মধ্যে পৌনপুনিক গণতান্ত্রিক্ অধিকার হরনের কারণ এইং শিক্ষার সার্বজনীন অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ বিষয়ে তারা অনুসন্ধানের ইচ্ছে জাগাতে চেয়েছিলেন। সব মিলে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের ভাবাদর্শগত ভিত্তি তৈরী এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিষয়গত প্রস্তুতি শক্তিশালী করার চেষ্টা সে সময় দুর্নিরীফ ছিলো না। কিন্তু এ সব আশাব্যঞ্জক দিকের পাশাপাশি নিরাশারত দিক ছিলো। তিন মাস ধরে ছাত্র সংগঠনের ঐক্য জোটের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সত্ত্বেও দেশের প্রধান অপ্রধান সব রাজনৈতিক দলেরই এক ধরনের নিস্পৃহতা লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছিলো। অস্বীকার করবো না, বর্তমান ১৫ দলীয় জোটের শরীক ৭টি দলের ও পরে ১১টা দলের জোট গঠনের আলোচনার সূত্রপাত হয় তখনই কিন্তু সম্মিলিত বা একক শক্তি হিসাবে কোনো রাজনৈতিক দলই ছাত্র সমাজের এই গণতন্ত্রের লড়াইকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে পারেনি। (১৬ই নভেম্বর ১০টি শ্রমিক সংগঠনের অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের সহ অন্যান্য দাবী সম্বলিত বিবৃতি ও ১১ই ডিসেম্বরে ছাত্রদের প্রতি তাদের সমর্থনসূচক বিবৃতি স্মরণে রেখে এ কথা বলা বোধকরি অযৌক্তিক নয়।)

এমনি একটি প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ই জানুয়ারীর দাবী মিছিল তথা 'রাস্তার কর্মসূচী' ঘোষনা করলেন। এ ধরনের রাস্তার কর্মসূচী ঘোষণার সময় যদিও একে 'শান্তিপূর্ণ' বলে বলা হলো এবং নেহাৎই 'দাবী মিছিল' বলে সনাক্ত করা হলো কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ১১ই জানুয়ারীর কর্মসূচীর রূপ (form) সম্পর্কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কোনো সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন নি। বরং সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী বিশেষতঃ নভেম্বর—জানুয়ারী পর্বে পরিষদের কর্মসূচী সমূহতে তৎকালীন

আন্দোলনের রূপ, তার যৌক্তিক পরিণতি, আন্দোলন পরিচালনার কৌশল, আন্দোলনে শৃঙ্খলার যে শিক্ষা কর্মী বাহিনীর জন্যে থাকা দরকার ছিলো তা ছিলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বরং ১১ই জানুয়ারীর কর্মসূচীকে এ্যাকশনমুখী কর্মসূচী, এমনকি বক্তৃতায় ও মিছিলে 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী বলে হাজির করা হলো। যাতে করে কর্মসূচী ঘোষণার পরবর্তী দিনগুলোতে ব্যাপক সংখ্যক কর্মী, সংগঠক ও সাধারণ ছাত্র Direct Action—এর প্রতি আগ্রহান্বিত ও প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। দিন গড়াতে লাগলো। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহটিতে বিভিন্ন সংগঠন তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক কর্মসূচীতে ব্যস্ত থাকলেন। ৫ই জানুয়ারী শিক্ষা মন্ত্রী ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসার প্রস্তাব পাঠালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তা নাকচ করে দেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর নিলিপ্ততা ভাঙবার জন্যে পরিষদ দলগুলোর দ্বারে দ্বারে ঘুরে সমর্থনসূচক একটি বিবৃতিতে সই করাতে থাকেন। ৬ই জানুয়ারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলার ছাত্র নেতাদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠানো এ প্রস্তাবে আলোচনার কোনো নির্দিষ্ট এজেণ্ডা থাকায় পরিষদ তা বাতিল করে দেন। ৮ই জানুয়ারী পরিষদের যে বিবৃতি দৈনিক সংবাদে ছাপা হয় তাতে বলা হয়েছিলো যে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাতিল, দমন নীতির পথ পরিহার ও উপযুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী এবং তিনজন ছাত্র বন্দীর মুক্তি দানের পরই তারা নতুন শিক্ষানীতির প্রণয়নের ব্যাপারে আলোচনায় তারা রাজী আছেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক দর কষাকষি চলতে থাকে এবং ৯ই জানুয়ারী আলোচনার সকল সম্ভাবনা (আশংকা?) বাতিত হয়ে যায়। ঐ দিন রাতে সরকারের পক্ষ থেকে কড়া প্রেসনোটে এই বলে হুশিয়ার করা দেয়া হয় যে, সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধীদের সচিবালয় দখলের এই পরিকল্পনা কঠোর হাতে দমন করা হবে। এই সরকারী হুমকির পাশাপাশি ১৮টি রাজনৈতিক দলের

ঘরে ঘরে গিয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ যে বিবৃতি সই করিয়ে এনেছিলেন ১০ই জানুয়ারী দৈনিক সংবাদে তাও ছাপা হয়েছিলো। ১০ তারিখ সারা ক্যাম্পাস যখন ঐ প্রেসনোটের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলো—ছাত্র নেতৃবৃন্দ তখন আলোচনায় বসার শেষ সম্ভাবনা নিয়ে এবং বিবৃতি দানকারী ঐ আঠারো দলীয় নেতাদের বক্তব্য শোনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে ১১ই জানুয়ারী সকাল ১১টা পর্যন্ত একটানা ৭২ ঘণ্টা নেতৃবৃন্দ আর কর্মীরা থাকলেন বিচ্ছিন্ন।

একদিকে কর্মসূচীর রূপ সম্পর্কে অস্পষ্টতার সুযোগে আন্দোলনের ভেতরকার স্বতঃস্ফূর্ততার প্রবনতাকে উস্কে করা হয়েছে, অন্যদিকে কর্মীরা জানেন না নেতৃবৃন্দ কি করেছেন। ফলে ১১ই জানুয়ারী সকালে হাজার পাঁচেক ছাত্রের বিরাট সমাবেশে নেতৃবৃন্দ যখন এসে দাঁড়ালেন তখন নেতা এবং কর্মী ও ছাত্রের মধ্যে বিশ্বাসের সামান্য ফাঁক তৈরী হয়ে গেছে। তারপরের ঘটনা সবারই জানা আছে। বটতলার সভায় পরিবর্তিত কর্মসূচী ঘোষনা করলে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, হৈ হুই গালের সূচনা হয়। ছাত্রদের বৃহত্তম অংশ পরিষদের শরীক দু' একটি সংগঠনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের নিষেধ অমান্য করে শিক্ষা ভবন অভিমুখে চলে যায়, নেতারা যান শহীদ মিনারে, ডাকসু ভবন কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র তছনছ করে ফেলে, এর পরপরই ঐ সব উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রে একাংশ পাল্টা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ঘোষনা দেয়।

এ কথা ঠিক যে, পরিষদ নেতাদের নিষেধ না মেনে অধিকাংশ ছাত্রই সেদিন সচিবালয় অভিমুখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ছাত্ররা আর পরিষদকে যথাযথ নেতৃত্ব ভাবছিলেন না। বরং আন্দোলনকামী ছাত্রদের নিষ্পাপ আবেগকে ব্যবহার করে এক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্তবাদী কর্মী সেদিন এই ঘটনার জন্ম দিতে পেরেছিলেন। ফলে অধিকাংশ ছাত্র নিষেধ অমান্য করা সত্ত্বেও এ কথা ভাবা ঠিক যে, এর দায়িত্ব অধিকাংশ ছাত্রেরই।

পরিষদ বলেছে তারা জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে কর্মসূচী পাল্টেছেন, অন্যদিকে ছাত্ররা বলেছে নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে কর্মসূচী পাল্টেছেন। বাস্তব

অবস্থা এমন ছিলো যে এ দু'য়ের কোনটি না ঘটলেও পরিষদকে সেদিন তার কর্মসূচী পাল্টাতে হতো। কেননা এটা যেমন সত্য যে, "আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার শর্ত হাজির ছিলো সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে" 'তেমনি এটাও সত্য যে, সমাজের সংবেদনশীল অংশ হিসেবে ছাত্র সমাজের এই আন্দোলনকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা আক্রান্ত সমাজের অপরাপর নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষগুলোর আন্দোলনকে যুক্ত করা ছিলো অত্যাবশ্যক। জানুয়ারী মাসের সেই সময়টিতে সমাজের একাংশের (ছাত্রদের) মধ্যে আন্দোলন যত তীব্রতাই লাভ করুক না কেনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তো দূরের কথা ফ্যাসিবাদকে পর্যন্ত এককভাবে পরাস্থ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই সে মুহূর্তে যে কাজ দুটি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিলো সেগুলো হলো—এক) আন্দোলনের উপাদানের ভিত্তিতে আন্দোলনকামী শক্তিকে আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা ; দুই) এই আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু অধিকার ও দাবী আদায় করা এবং আন্দোলনকে ক্রমাগতভাবে জিইয়ে রেখে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতিতে ঠেলে দেয়া। এই দুইয়ের কোনটিই নিয়ন্ত্রণবিহীন এ্যাকশনমুখী কার্যক্রমকে সমর্থন করে না। যখন সমাজের অপরাপর অংশে আন্দোলনমুখী প্রবণতা প্রাধান্য পায়নি, এবং রাজনৈতিক দলগুলো পর্যন্ত নিশ্চেষ্টতা দেখাচ্ছে তখন কি কেবলমাত্রই ছাত্র সমাজের দৃঢ় ও আপোষহীন জঙ্গী মনোভাব আন্দোলনকে বৃহত্তর রূপ দিতে পারে? পারেনা বলেই আমাদের বিশ্বাস। পরিষদের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামোগত দুর্বলতা (অর্থাৎ সারাদেশের ছাত্র সমাজকে পরিষদ কর্তৃক শক্তিশালী বাঁধনে বাঁধতে না পারা), আন্দোলনকে কর্মসূচীতে ভিত্তিতে জোরদার করে তুলে নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনার ভিত্তিতে পরিচালনা করার ব্যাপারে অগ্রণী না হওয়া ইত্যাকার সমস্যাকে সামনে রেখে পরিষদ তাদের ১১ই জানুয়ারীর কর্মসূচী পরিবর্তন না করে নিরূপায় হয়ে পড়েছিলো। ১১ই জানুয়ারীর ঘটনা থেকে পরিষদের শরীক দলগুলোর কেউ কেউ এ সব বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেছেন, কেউ কেউ করেন নি। তা যাই হোক, ১১ই জানুয়ারীর

ঘটনার পর আন্দোলনের একটি বড় ধরনের পর্যায়ের অবসান ঘটে এবং পরবর্তী কর্মসূচী—১৪ ফেব্রুয়ারী বটতলায় সমাবেশ, সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান ধর্মঘটের কথা পরিষদ ঘোষণা করে। পরিষদের পরবর্তী কর্মসূচীর দিন আসবার আগেই রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। ১৪ই জানুয়ারী জামিয়েতুল মোদাররেসিনের সম্মেলনে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারী ও শহীদ মিনার সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি উচ্চারিত হয়। সাথে সাথে দেশে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলবার জন্যে 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের, কথাও ঘোষণা করা হয়। এই সমস্ত আপত্তিকর ও উস্কানীমূলক কথাবার্তার প্রতিবাদে জানুয়ারী মাসে বিবৃতিদানকারী ১৮টি দলের মধ্যেকার ১৫টি দল যৌথভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের উদ্যোগ নেয়, পাশাপাশি দেশের গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে একুশে উদ্‌যাপনের জাতীয় কমিটি, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর ঐক্য জোট 'সাংস্কৃতিক জোট' গঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস উদ্‌যাপনে ১৫ দলীয় ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচী বা ইস্যু ভিত্তিক ঐক্য মোর্চার কর্মসূচী ছিলোনা —ছিলো সিএমএলএ'র একুশ সংক্রান্ত উক্তির প্রতীকী প্রতিবাদ (token protest), যেমনটি ছিলো ছাত্রদের শিক্ষা দিবস পালনের কর্মসূচী।

পরের দিনগুলোতে অবস্থা ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে নিত্য দিন সরকারের হুমকি, বেশ কয়েকজন ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার ও পরে মুক্তি দান, আসাদ স্মৃতি সৌধ ভেঙ্গে ফেলা প্রভৃতি ঘটনা এবং ঠিক তারই পাশাপাশি ছাত্রদের জঙ্গী চেতনা জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের সাথে পরিষদ কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের সংঘর্ষের ঘটনায়। দিন গড়িয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারী আসে এবং সেদিনের রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের ঘটনা সংঘটিত হয়। এর বিস্তৃত বর্ণনা বাহুল্য মাত্র—নারকীয় হত্যাকাণ্ডেরও সীমা আছে ১৪ তারিখ সে সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ১৪ তারিখ বিকেলে ১৫ তারিখ হরতালের ডাক দেয়া হলেও সে ঘোষণা সারা দেশে দূরে থাক শহরের সর্বত্রও হড়াতে পারেনি—বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী হামলা ও রাতে

সান্ধ্য আইন জারীর ফলে। ১৫ তারিখ ১৫ দলের রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই গ্রেফতার হন। পরিষদ নেতারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন এবং পরিষদের একাংশ ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখের কর্ম সূচী ঘোষণা করেন, যা পরে আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

মধ্য ফেব্রুয়ারী রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান ও বহু সাথীর আত্মদান সত্ত্বেও পরবর্তী কয়েকটি দিন আন্দোলনে একটা স্তিমিতি আসে, অবস্থা তখন এরকম : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচী গ্রহণে দ্বিধান্বিত, পরিষদের নেতারা মাথায় হুলিয়া নিয়ে আত্মগোপন করে আছেন। এতদ্বসত্ত্বেও ৬ই মার্চ শোক দিবসের ডাক দেন আত্মগোপনকারী পরিষদ নেতারা। ১৮ই মার্চ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভ করেন বৈকি কিন্তু বেরিয়ে এসেই কোনো কর্মসূচী গ্রহণে তাদের দ্বিধা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে ১৫ দলের পক্ষ থেকে যে ঘোষনা পাঠ করার কথা ছিলো নিজেদের সমঝোতার অভাবে তা পড়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু কোনো কোনো বৃহৎ দলের নেতা 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে' তাদের অঙ্গীকার ঘোষনা করে ইতিমধ্যে কড়া সেন্সরসীপের অধীনস্থ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে মোটেই দ্বিধান্বিত ছিলেন না।

মধ্য-ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের সবার মধ্যেই এই উপলব্ধি তীব্র হয়ে ওঠে যে, আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যাভিমুখী করতে হলে ইস্যুভিত্তিক সংগ্রামকে কর্মসূচীর ভিত্তির ওপরে খাড়া করতেই হবে। পরিষদ-অভ্যন্তরে আগাগোড়াই আমরা এ কথা বলছিলাম। আর সেই সবেরই প্রকাশ হিসেবে ২৬শে মার্চ পরিষদ নেতারা ১০ দফা দাবীর কথা ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে। ইতিমধ্যে ১৫ দলের ১১ দফা দাবী ঘোষিত হয় বৈকি কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোতে ক্রমেই যেনো এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, আন্দোলন রচনায় রাজনৈতিক দলের যে Decisive move থাকা দরকার ১৫ দলীয় জোটে

তা তখনো অনুপস্থিত।

তারপরের ঘটনাগুলো আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। একদিকে ঘরোয়া রাজনীতির সূত্রে ১৫ দলের ঘরোয়া সভা, কর্মী বৈঠক, দাবী দিবস, দাবী সপ্তাহ, দেশব্যাপী সফর—তারই পাশাপাশি বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নিজদের ঘরের মধ্যে বেসামাল টালমাটাল অভ্যন্তরীণ কোন্দল। বিপরীত দিকে সংগ্রাম পরিষদের ব্যাপক বিস্তৃতি, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে আরো শক্তি সংহত করা, ধীর-স্থির কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে জিইয়ে রাখা, সারা দেশে ১০ দফার প্রচার আন্দোলন, বৃহত্তর আন্দোলনের জন্যে দেশব্যাপী কর্মী বাহিনীকে প্রস্তুত করা। ছাত্র সমাজের সংহতির মুখে হামলা এসেছে সরকারী পাণ্ডা বাহিনীর, বিশ্বাসঘাতক বাবলু চক্রকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু এসব ঘটনা ঐক্যে চিড় ধরায় নি বরং শক্তিকে সংহত করেছে, আন্দোলনে জোয়ার এনেছে। এসব কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই পরিষদ ২রা অক্টোবর ঢাকায় ছাত্র মহা সম্মেলন করেছে—যদিও সম্মেলন অর্থাভাব ও বন্যা পরিস্থিতির জন্যে আশানুরূপ সাড়া জাগায় নি। তবু এটা ঠিক যে, ছাত্ররা এই সম্মেলনকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে এবং এখানে থেকেই পরবর্তী বৃহত্তর কর্মসূচী চেয়েছে। পরিষদ ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের সমঝোতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১লা নভেম্বর 'প্রত্যক্ষ আন্দোলন দিবস' ঘোষণা করেছে তথাপি তাতে কর্মীদের একাংশের হরতালের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি-পরিষদ তাদের আন্দোলনের (form) সম্পর্কে আবারও অনির্ধারিত অবস্থা ও অনিশ্চিয়তা মুখোমুখি হয়েছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, পরিষদ ১৫ দল ও ৭ দলের বিক্ষোভ দিবস ও প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচীর সাথেই রয়েছে। এবং আগামীতে হয়তো এদের সাথে একত্রে 'হরতাল' ধরনের কর্মসূচীও ঘোষণা করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, ১লা নভেম্বর সহ আগামী দিনগুলোতে ঢিমে তেতলা গতিতে অগ্রসরমান রাজনৈতিক দলগুলো কতদূর যাবে এবং তার চেয়ে গতিশীল কিন্তু পাশাপাশি প্রবহমান ছাত্র আন্দোলন শেষাবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? প্রশ্নটি উঠছে এই কারণেই যে, আজকের দিনে ফ্যাসি

বাদের সামাজিক ভিত্তিকে দুর্বল করার সাথে সাথে পুঁজিবাদের মর্মমূলে আঘাত হেনে আন্দোলনকে যে বিপ্লবী গণতন্ত্রের আন্দোলনে রূপান্তরিত করা দরকার তা কেবলমাত্রই ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের অংশ গ্রহণ, বিশেষতঃ শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের যে অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা ছিলো এবং সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের ভাবাদর্শগত জমিন তৈরী ও বিপ্লবী আন্দোলনের বিষয়গত প্রস্তুতির দরকার ছিলো তা অর্জন পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্যে আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে শ্রমিক সংগঠনের জোট ও কৃষক সংগঠনের জোটকে অনেক বেশি সক্রিয় রাখা দরকার ছিলো, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলো নিষ্ক্রীয় থেকেছে এবং কেবলমাত্রই অর্থনীতিবাদী আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ছাত্রদের মানস জমিনে যেটুকু সমাজ পরিবর্তনমুখী আন্দোলনের চিন্তার বীজ বপন হয়েছে তার কোনো বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র এখনো তৈরী হয়নি। আর সে কারণেই আগামী মাসগুলোতে যে আন্দোলনের সম্ভাবনা জ্বলজ্বল করে উঠছে তার দিক নির্দেশনার প্রশ্নও সেই সম্ভাবনার মতোই জ্বলজ্বল করে উঠেছে তার উত্তর বিষয়ে নিসংশয় নাহলে বিপ্লবী বাম কর্মীদের কাছে আন্দোলনের রূপ সম্পর্কে এই অনিশ্চিয়তা কেবলমাত্রই একটি আশংকার কথাই মনে করিয়ে দেবে—যা আশাব্যঞ্জক নয়।

[তিন]

মূল্যায়নের বিভিন্ন ধারা

আন্দোলনের নতুন দিক-নির্দেশনা ও সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিষদ যদি এগুতে চায় তবে তার অতীত আন্দোলনেরও একটা মূল্যায়ন তাকে খাড়া করতে হবে। আশার বিষয় এই যে, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে মূল্যায়ণহীন অন্ধ বধির পদক্ষেপ নেয়া হয় পরিষদ তা করেছেনা। বারবার তারা নিজেদের অভ্যন্তরে মূল্যায়ন ও আনুষাঙ্গিক প্রশ্নে মতবাদিক সংগ্রাম পরিচালনা করছে। তারই আভাস পাওয়া যায় পরিষদের শরীক সংগঠনগুলোর নিজ নিজ মূল্যায়ন প্রয়াসে। ডাকসু মুখপত্র 'ছাত্রবার্তা'র ডিসেম্বর থেকেই এই প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ছাত্র ঐক্য ফোরামের 'ফোরাম' কাগজেও এ বিষয়ে মূল্যায়নধর্মী রচনা আগে-পরে প্রকাশ পেয়েছে। মধ্য ফেব্রুয়ারীর পর অপরাপর সংগঠনও তাতে যোগ দিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পরিষদ ও তার বাইরে পুরো আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির মূল্যায়ন ও ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে যে কয়েকটি মূল্যায়ন আলোচনার দাবীদার তার মধ্যে রয়েছে ফেব্রু-মার্চে প্রকাশিত ২নং বুলেটিন, ১৪ই এপ্রিল প্রকাশিত ইশতেহার, ২৬শে এপ্রিল প্রকাশিত জয়ধ্বনি, ২৪শে মে সংখ্যা ইশতেহার, ফোরাম এর জুন জুলাইতে প্রকাশিত ২৫ সংখ্যক বুলেটিন, ১৫ই জুলাই প্রকাশিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং ২রা অক্টোবরের ইশতেহার। তৎকালীন জাসদ নেতা সিরাজুল আলম খানের স্বাক্ষর সম্বলিত ফেব্রুয়ারী-মার্চের বুলেটিন (সংখ্যা-২) ও ১৪ই এপ্রিল প্রকাশকের নামহীন ইশতেহারের বক্তব্য গোড়াতে খানিকটা মিল পাওয়া যায় কিন্তু ২৪শে মে'র ইশতেহার বেরুলে দেখা গেলো যে, এটি জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও বুলেটিন (২)-এর সাথে এর মতানৈক্য রয়েছে। জয়ধ্বনি ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের। এ সব মূল্যায়নের নিরীক্ষার সময় প্রকাশকালের ধারাক্রম অনুসৃত হয়েছে যাতে করে পাঠক ক্রমধারাটি বুঝতে পারেন।

বুলেটিন ও ইশতেহারের মূল্যায়ন ঃ

ফেব্রুয়ারী-মার্চে প্রকাশিত 'বুলেটিন' (নং-২) ও ১৪ই এপ্রিল প্রকাশিত 'ইশতেহার' আন্দোলনের মধ্যেকার "ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও হটকারিতা মোকাবেলা" করে একটি "বৈপ্লবিক আন্দোলন" রচনায় উৎসাহী। ইশতেহার মনে করে "রাজনৈতিক দল সমূহের আশীর্বাদ নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের হিংস্রতাকে উপেক্ষা করে কার্যকরী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গড়ে তুলেছে। বুলেটিন মনে করে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে উপস্থিত হবার পর "বাড়াবাড়ি এড়াতে না পেরে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। গোটা এলাকা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। মহল বিশেষের উস্কানীতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী পালনে ব্যতয় ঘটলো।" এ সব বক্তব্য যারা হাজির করছেন তারা এও জানেন যে, "কোনো কালেই কোনো সামরিক জান্তা নখ ও দন্তহীন হয় না" (উদ্ধৃতি—ইশতেহার)। দেশে যে সামরিক আইন আছে এতো তারা জানেনই ; তবু তারা "সেই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সরকারের কাছ থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা" আশা করেন এবং মনে করেন "সরকার সচেষ্ট হলে ও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করলে এই (১৪ই ফেব্রুয়ারী) অনভিপ্রেত রক্তক্ষয়ী ঘটনা এড়ানো যেত।" এই বক্তব্য বুলেটিনের ; ইশতেহারের বক্তব্যে এই আশাবাদের একটি কারণ পাওয়া গেছে, তা হলো "ক্ষমতাসীনদের মধ্য থেকে——গনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অংশ বেরিয়ে আসতে পারে।" ফেব্রুয়ারী-মার্চে প্রকাশিত বুলেটিন যেখানে "সঠিক আন্দোলন রচনার প্রশ্নে রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের দোদুল্যমানতা, অস্থিরতা, সিদ্ধান্তহীনতা, হঠকারিতা বা আপোষকামিতার" ভয় করছিলেন দু'মাস না পেরুতেই ইশতেহার প্রকাশকরা আবিষ্কার করেছেন যে, "আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সুবিধাবাদী ঝোঁক, আপোষমুখীনতা, আত্ম সমর্পনকারী মানসিকতা প্রাধান্যও পেয়েছে।" ইশতেহার প্রকাশকদের অবশ্য এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তারা মনে করেন এ দেশের

বেশীর ভাগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের স্বার্থের সাথে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ বলে এরা "আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবার ঝুকি নিতে চায়না।" এই সমস্যা সমাধানে তাদের প্রস্তাবনা—"ছাত্রদের, শ্রমিকদের, কৃষকদের, কর্মচারীদের, মাঠের আন্দোলনে সক্রিয় ও বলিষ্ঠ-ভাবে উপস্থিতি।" তারা এও মনে করেন যে, এই সব সামাজিক শক্তির যথাযথ সমাবেশ ঘটলে আন্দোলন আরো বলিষ্ঠতা ও ব্যাপকতা লাভ করতো এবং "তার সমাবেশ ঘটানোর কাজটি করতে হবে এখনই।" শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলনে যুক্ত করা নিয়ে আপত্তি নেই—থাকতেই পারে না। কিন্তু এই শক্তির সমাবেশ ঘটবে কিভাবে, কারা করবেন এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোনো উত্তর না দিয়ে রহস্যাবৃত উত্তর দিয়েছেন তারা "আন্দোলনে অংশগ্রহণরত সংগ্রাম পরিষদ সমূহের যৌথ উদ্যোগ।"

ইশতেহার প্রকাশকরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি এক ধরণের জুজু দেখা রোগে ভোগেন বলেই আমাদের মনে হয়েছে। আর তাই তাদের বক্তব্য : "আন্দোলনের প্রশ্নে কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলের মোর্চাই যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক দলের মোর্চার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা আন্দোলনকে আপোষের চোরাবালিতে নিয়ে ঠেকিয়ে দেবে।" এ কথা বলার সময় তারা ভুলে যান যে, এই রচনার শুরুতে তারা নিজেরাই বলেছেন "রাজনৈতিক দল সমূহের আশীর্বাদ নিয়ে কার্যকরী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়েছিল—যারা এই রকম একটি আন্দোলনের সূচনা করতে পেরেছে। রাজনৈতিক দল প্রশ্নে ইশতেহার প্রকাশকদের ঢালাও বিরূপ মনোভাব রাজনীতি ও দল সম্পর্কে তাদের শিশুসুলভ অজ্ঞতারই পরিচায়ক শুধু নয়—একই সঙ্গে আরেক ধরনের রাজনীতির প্রতিফলক যে নব-উদ্ভাসিত রাজনীতিক দর্শনের প্রবক্তারা মনে করেন রাজপথ থেকে বিকশিত ও পরিবর্ধিত নেতৃত্বকে জনগন বিকল্প হিসেবে বেছে নেবেই। রাজনীতি ও দল সম্পর্কে এদের অজ্ঞতার রূপ এ রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এরা যখন দেশে সামরিক আইন জারীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন তখন একমাত্র কারণ হিসেবে খাড়া করেন রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা। প্রথমতঃ এরা ভুলেও মনে করিয়ে দেন না যে, এই ব্যর্থতা সকল রাজ-

নৈতিক দলের নয়, কেবলই বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া দলগুলোর। এদেশের জনগণের সামনে যে বুর্জোয়া রাজনীতির বৃত্ত রয়েছে তাকে ভেঙ্গে চুরে ফেলে এটা দেখানোর প্রয়োজন মনে করেন নি যে, বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার দায়ভার বুর্জোয়াদেরই—তাদের অনিবার্য পরিণতিই এই। দ্বিতীয়তঃ সামরিক শাসন ও চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদ যে পুঁজিবাদের সংকট মূহূর্তের বাঁচবার পথ, এ দেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের অনিবার্য সংকট মোচনের, ব্যর্থতা ঢাকবার পথ যে সামরিক ফ্যাসিবাদ তা তারা কখনোই মনে করেন নি বা মনে করতে পারেন নি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এদের ঢালাও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমালোচনার ভাষা ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের প্রথম দিনগুলোর রাজনীতির সমালোচনা থেকে ভিন্ন কোনো রূপ নিতে পারেনি। এরা বলছেন 'জিয়ার মৃত্যু ঘটে, সাত্তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সে ক্ষমতাকে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে আইন সঙ্গত করেন, সাত্তারের পতন ঘটে সামরিক শাসন জারি হয় এবং জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন।" এ সবই সত্য—তবে তা প্রাতিভাসিক সত্য মাত্র, মর্মবস্তু ভিন্ন। জনগণের সার্বিক আশা আকাঙ্খার রূপ এটি নয়। জনগণ যে কঠোরতর এক জীবনের ভেতরে বিগত সরকারের আমলে বা তারও আগে কালাতিপাত করেছে তার কারণ ব্যক্তি শেখ মুজিব, খন্দকার মোস্তাক, জিয়াউর রহমান বা আবদুস সাত্তার নয়—গতানুগতিক বুর্জোয়া পাতি বুর্জোয়া দলগুলোর অনিবার্য 'উপহার' মাত্র। রাষ্ট্র পরিচালনার সাবেক সরকারের ব্যর্থতার দায়ভার বিপ্লবী দলের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার পেছনে আর কি যুক্তি থাকতে পারে কুযুক্তি ছাড়া? ব্যর্থতা যেখানে তা হলো সঠিক বিপ্লবী দল বা সর্বহারা শ্রেনীর পার্টির দুর্বল উপস্থিতি। সে কথার ধারকাছ দিয়ে ইশতেহার প্রকাশকরা যান নি, কেননা রাজনীতি' বলতে তারা বুর্জোয়া পাতি-বুর্জোয়া রাজনীতির বাইরে যেমন কোনো রাজনীতি বোঝেন না। তেমনি 'দল' বা পার্টি বলতেও তারা অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ। বিগত ১২ বছরে জনগণের সামনে, জনগণের কল্পনার ভেতরে তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিভূ ও সমাজ পরিবর্তনের প্রতিফলক রাজনীতি যে জায়গা করে নিতে

পারেনি বোধকরি তার কারণ এই বক্তব্যের প্রবক্তারাই। এরা দেখতে পান "স্বৈরতন্ত্র বন্দুকের নলের আগায় ভর করে সাম্রাজ্যবাদের মদতে বারবার রাজনৈতিক মঞ্চে উপস্থিত হয়।" কিন্তু বুঝতে অপারগ হন যে, আজকের দিনে পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়া শাসনের সংকটে বুর্জোয়াদের এ ভিন্ন অন্য পথ নেই—এর মধ্যে অনতিক্রম্য অতিকথা সদৃশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া দেখার কোনো মানে হয়না। সাম্রাজ্যবাদের যেটুকু ছায়া এদেশের অর্থে-রাজনৈতিক মঞ্চে দৃশ্যমান তা আজকের বিশ্ব অর্থ-নীতির কারণে বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ যোগাযোগ মাত্র। তার লক্ষ্যও জাতীয় বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব রক্ষা, ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

ইশতেহার-এর এক জায়গায় বলা হয়েছে: "ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিচর্যার মাত্রা তারতম্যের মধ্যে জন্ম নেয় দুটি শব্দ—হঠকারিতা ও সুবিধাবাদ। প্রয়োজনীয় লালন ও পরিচর্যার অভাবকে চিহ্নিত করা যায় সুবিধাবাদ হিসেবে আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদক্ষেপকে চিহ্নিত কর যায় হঠকারিতা বলে।" এই ব্যাখ্যা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করছে হঠকারিতা ও সুবিধাবাদের প্রকৃত স্বরূপ তারা বোঝেন না। হঠকারিতার স্বরূপ যে তারা বোঝেন না তা এই ব্যাখ্যা ও তার আগের বক্তব্যেও স্পষ্ট। তারা বলছেন, "জীবনযুদ্ধে মার খাওয়া সংগ্রামোন্মুখ মানুষগুলো একটি রাজনৈতিক লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে বিজয় ও অভিজ্ঞতা অর্জনে পৌছুঁবে সংগঠিত সংগ্রামী জনতার স্তরে। এই সংগ্রামী জনতা শান্ত সুনিবিড় পরিবেশে গড়ে উঠতে পারে না। সংগ্রামী জনতার এই সত্ত্বা অন্যায় অবিচারের বিপরীত অবস্থানের মধ্যে অবস্থান করে প্রতিপক্ষের সাথে ক্রমাগত লড়াইয়ের মধ্যে অর্জন করে লড়াকু অস্তিত্ব। এ লড়াকু জনতার বাসস্থান ঘরে ঘরে হলেও এর বিকাশ ও পরিবর্ধনের একমাত্র স্থান রাজপথ। যারা আপোষহীনভাবে এগিয়ে যেতে চান তাদেরঅবশ্যই একথাটি বুঝতে হবে যে, সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের নিয়ত ধারা ইচ্ছে-অনিচ্ছে নিরপেক্ষভাবে ঘটে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যা করতে পারে তা হলো এই ঘটমান ঘটনাকে প্রগতির ধারায় কাজে লাগাতে। তার

যথাযথ লালন ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় ধারাবাহিক ঘটনা সমূহের।" অন্যত্র বলা হচ্ছে, "সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাত তার আপন প্রয়োজনে পথ করে নেয়। তাই কখনো একটি অবস্থিত আন্দোলনকে আন্দোলনকারীরা পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে এগুতে সক্ষম হয় না।"

এই দুই উক্তিতে ইশতেহার প্রকাশকদের যে মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তারই নাম হঠকারিতা। কেননা লক্ষ্য করুন ইশতেহার প্রকাশকরা বলছেন তাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। যদি সেটাই তাদের লক্ষ্য হয় তবে তাদের মানতেই হবে একটি দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে সঠিকভাবে-বিকশিত একটি সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে। সেই পার্টির অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে রাজপথের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি বিপ্লবী শক্তির বিকাশের অলীক কল্পনা একমাত্র নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষেই করা সম্ভব। জীবনযুদ্ধে মার খাওয়া মানুষদের রাস্তার আন্দোলনে এনে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ না রেখে ছেড়ে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের নিয়ত ধারাকে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে চলতে দিলে অভিজ্ঞতাই তাদের সংগঠিত করবে কোনো মার্কসবাদী কোনো অবস্থাতেই তা বলতে পারেন না। রাজ-রাজনৈতিক দলের প্রতি এদের যে বিরাগ জন্মেছে তার উৎস পার্টির প্রয়োজনীয়তা ও পার্টি গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এদের এই অজ্ঞতা থেকেই। হঠকারিতারই ভিন্ন পিঠ সুবিধাবাদ। ইশতেহার প্রকাশকরা জানেন না যে, সেই সম্ভাবনারও বিদ্যুৎ চমক তাদের লেখায় আছে। যে নেতৃত্বকে তারা শ্রেণীগত দুর্বলতার ক্লিষ্ট বলে রায় দিয়েছেন রচনার শুরুতে রচনার বহু অংশে তাদের কাছেই আশ্রয়প্রার্থী হয়ে বলেছেন "এগুনো না এগুনো নির্ভর করছে বিজ্ঞ রাজনীতিকদের ভূমিকার ওপরে" এবং সর্বত্র ঐ নেতৃত্বের কাছে আশা করেছেন "বলিষ্ঠ উপস্থিতি।"

ইশতেহারের ১৪ই এপ্রিল সংখ্যায় একটি সত্য উচ্চারিত হয়েছিলো কথার ফাঁকে: দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে বুঝতে হবে কোথায় কোথায় থেকে বাধা আসতে পারে। এবং কেবল তখনই

সাবিক আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা যাবে।" এ কথাটি কি এপ্রিলে কি অক্টোবরে সব সময়ই বোঝা দরকার এবং এমনকি ইশতেহার প্রকাশকদের ওপর প্রয়োগ করাও জরুরী।

জয়ধ্বনির মূল্যায়ণ :

২৬শে এপ্রিল প্রকাশিত জয়ধ্বনিতে "ইশতেহার-এর দর্শন বনাম প্রকৃত ছাত্র আন্দোলন" কথাটি থাকলেও ইশতেহার-এর দর্শনের সমালোচনাই এর উপজীব্য বিষয়।

ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ইশতেহার প্রকাশকদের 'মধ্যবিত্তসুলভ স্ববিরোধিতা'র সমালোচনা করলেও নিজেরা তার বাইরে আসতে পেরেছেন বলে মনে হয়না।

তারা বলছেন : "আজকের ১৫ দলের মধ্যে কয়টি রাজনৈতিক দল আছে যারা শ্রমিক কৃষককে শ্রেণী সচেতন করে তোলার দায়িত্বের কথা ভাবেন বা করেন? অধিকাংশই তা করেন না। আর রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা এখানেই।" অধিকাংশ দল এ কাজ করবেন কিনা সেটা যে ঐ দল সমূহের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণী অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত এ কথা তো ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের অজানা থাকবার কথা নয়। ১৫ দলের অন্তর্ভুক্ত বুর্জোয়া দলের কাছেও কি তারা এই ভূমিকা আশা করেন? যদি সত্যি সত্যি করেন তবে তা তাদের অজ্ঞতা ও ভুল; যদি না করেন তবে ঢালাওভাবে এ ব্যর্থতার দায়িত্ব দেয়া সকল দলকে 'রাজনৈতিক দলগুলো' বলা অসঙ্গত। যদি শ্রমিক কৃষককে শ্রেণী সচেতন করে তোলার অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো দল বা দলগুলো ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে অভিযোগ তার/তাদের বিরুদ্ধেই তুলতে হবে। ১৫ দলের বহুচারিত্রিকতা সত্ত্বেও আন্দোলনের কর্মসূচীতে বামপন্থী দলগুলোর বক্তব্য প্রাধান্য পাচ্ছে কি না জয়ধ্বনি সে সে বিষয়ে নীরব।

ইশতেহারের জেনারালাইজেশন বা সাধারণীকরনে ভূত অংশতঃ জয়ধ্বনির

কাধেও চেপেছে। বাহাত্তুর সালের সংবিধান সংরক্ষণের প্রশ্নে ১৫ দলের "অধিকাংশের" অতীত ব্যর্থতার জয়ধ্বনির প্রকাশকরা ব্যথিত কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধানে অনীহ এবং "এদের ব্যর্থতার শ্রেণীগত মর্মবস্তু উপলব্ধি" করতে নিশ্চেষ্ট। আজকের দিনে প্রকৃত গণতন্ত্র অর্থ যে কেবল সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্র এবং তা একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী ও তাদের নিজস্ব-পার্টির পক্ষেই সুনিশ্চিত করা সম্ভব এ কথা আমাদের নিজেদের হৃদয়ঙ্গম করা এবং ছাত্র-জনতার সামনে অতীত ব্যর্থতার শ্রেণী সমালোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা দরকার। ব্যর্থতার ঢালাও উল্লেখের কারণহীন দিক-নির্দেশ অর্থহীন ক্রীড়া কৌতুকেরই সামিল। সেই বিবেচনায়ই গণতন্ত্র রক্ষায় ভবিষ্যতে 'সব দলের' কাছ থেকে সমভাবে সাফল্য আশা করাও সমীচীন নয়।

জয়ধ্বনিতে ১৫ দলের ঐক্যবদ্ধভাবে ৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে অতীতের ৭২ সালের সংবিধানের সমালোচকদের এক দফা শোনানো হয়েছে। কিন্তু একথা ভুলে গেলে তো চলবে না সামরিক ফ্যাসিবাদের পরিবর্তে ৭২ সালের সংবিধান কায়েমের দাবি আর ৭৪ সালে ৭২ সালের সংবিধানে সমালোচনা এক বাটখাড়ায় মাপা যায় না। সর্বোপরি শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের মুক্তিই যদি লড়াইয়ের শেষ লক্ষ্য হয় তবে এই ইস্যুভিত্তিক ঐক্যে সন্তুষ্ট ও উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই বরং কর্মসূচীতে দূর-লক্ষ্যের কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা, আন্দোলন সে পথে এগুচ্ছে কিনা, সে সম্ভাবনা বিকাশে বাম-দলগুলো সফল হচ্ছে কিনা, সেটাই ভাববার বিষয়।

জয়ধ্বনি অভিযোগ করেছে "আন্দোলনকে সঠিক ও প্রকৃতভাবে গড়ে তোলার স্বার্থে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও করণীয় স্থির করবার কথা বললেই ইশতেহার গোষ্ঠি শোরগোল বাধায়।" কিন্তু আমাদের প্রশ্ন তাতে কি আমাদের পিছিয়ে পড়ার কোনো কারণ আছে?

ইশতেহার (২৪শে মে সংখ্যা)-এর মূল্যায়ন ঃ

ইশতেহারের এই সংখ্যার তিনটি গুরুত্ববহ দিক আছে। এক) এ সংখ্যায় জয়ধ্বনির সমালোচনার জবাব দেবার চেষ্টা হয়েছে; দুই) ইশতেহারের প্রকাশকরা আত্মপ্রকাশ করেছেন যে, তারা জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য। (তাদের এই আত্মপ্রকাশ থেকে এটি সহজেই অনুমেয় কেনো এরা ১৪ এপ্রিলে আত্মগোপন করেছিলেন এবং ২৪ মে আত্মপ্রকাশ করেছেন।) তিন) এরা বুলেটিনের (২ নং) বক্তব্যের পরোক্ষ কড়া সমালোচনা এনেছেন।

'দোলায়মান তত্ব বনাম ইশতেহার' শীর্ষক নিবন্ধে জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের মুখপত্র ইশতেহার জাসদের প্রধান তাত্বিক সিরাজুল আলম খানের সই করা বুলেটিনের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলছে ঃ "আন্দোলনকারী শক্তিকে কোনো কটুর বিশেষণে ভূষিত করে তাদের ঠেকানোর জন্যে সরকারের সদিচ্ছার কাছে আবেদন জানাতে হবে যেন পরিস্থিতির ঘরে অবনতি না ঘটে, ভয়াহব দুর্যোগ যেন আর না আসে" এটা ঠিক নয়। ইশতেহারে 'হঠকারী', অতি বিপ্লবী মুখোশধারী' ও 'বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমওয়ালাদের' চিহ্নিত করার হুকুম জারিরও বিরোধিতা করেছে। বলা দরকার যে, এই শব্দগুলোও বুলেটিন থেকে আহরিত।

ইশতেহারের প্রকাশকরা তাদের মূল বক্তব্য থেকে ইতিমধ্যে সরে যান নি তবে তাদের সামান্য 'বোধোদয়' ঘটেছে। তারা স্বীকার করছেন যে, 'গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের সাথে সমাজের মেহনতী মানুষের ও গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলন আনুপাতিক ভাবে সম্পৃক্ত থাকলে ভালো হতো।' আসলে ব্যাপারটা 'ভালো হওয়া' বা 'খারাপ হওয়ার' ব্যাপার নয়। আমরা আন্দোলনের গোড়া থেকেই বলে আসছি যে, এই আন্দোলনকে যথার্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে বিপ্লবী গণতন্ত্রের আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে চাইলে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে, এটা অত্যাবশ্যক। সে জন্যেই আন্দোলনকে কর্মসূচীর ভিত্তির ওপর দাঁড়

করানো দরকার—যে কর্মসূচীতে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকবে। এই বিষয়টি ইশতেহার প্রকাশকরা দেরীতে হলেও বুঝেছেন ঠিকই কিন্তু যা অত্যাবশ্যক তাকে ভেবেছেন ভালো বা খারাপ হওয়ার ব্যাপার।

শুধু তাই নয়, এই 'ভালো হওয়া'র ব্যাপারটি আবার তারা তার ঠিক পর মুহূর্তেই 'সঙ্গতিপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবস্থান' 'আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভারসাম্য' এবং 'দ্বিমুখী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার, প্রসঙ্গ টেনে অস্পষ্ট ও কুহেলিকাপূর্ণ কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন।

ইশতেহার প্রকাশক ছাত্রলীগ (মু-হা) কেনো 'রাজনৈতিক অঙ্গনের সমালোচনা, করেন তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ সংখ্যায়। তারা বলছেন, "রাজনৈতিক অঙ্গনের সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দুর্বলতাগুলোকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পরিবেশ সৃষ্টি করা, উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।" ইশতেহার প্রকাশকদের এই উদ্দেশ্যের কথা বলে ফেলায় ভালো হয়েছে। কেননা এতে করে উদ্দেশ্যের সূত্র খুঁজতে আমাদের কষ্ট কচ্ছেনা, সময়ও ব্যয় হচ্ছেনা। লক্ষ্যণীয় এই যে, ছাত্রলীগ (মু-হা) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামের একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করে 'উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি ও নেতৃত্বে বিকাশ ঘটতে' চান। তা হলে যে কোনো সাধারণ পাঠকের কাছে কি অর্থ এই দাঁড়ায় না যে। তারা বর্তমানে কোন দলকে উপযুক্ত শক্তি ও নেতৃত্বে মনে করেন না—এমনকি জাসদ'কেও নয়? তারা আবারও বলছেন, 'অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা বলছি ঠিকই।' যদি এটা তারা মনে করেন যে, জাসদ উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি ও নেতৃত্ব নয় তবে কেনো তারা এখনও জাসদ ও তার নেতৃত্বকে সমর্থন দিচ্ছেন?

এরা মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলো বারবার ব্যর্থ হয়েছেন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এবং তারা যদি এভাবেই ব্যর্থ হতে থাকেন তবে 'জনতা তাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্যে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি

গড়ে তুলবে।" এই বিকল্প শক্তির কোনো ব্যাখ্যা এদের কাছে নেই। তদুপরি জনতার আন্দোলনকে সঠিক খাতে অর্থাৎ গণতন্ত্র, বিপ্লবী গণতন্ত্র ও সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে নেয়া সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির পক্ষেই সম্ভব। এটা যে কোনো মার্কসবাদীই জানেন। সেই পার্টির পতাকাতলেই আমাদেরকে সমবেত হতে হবে। কেউ যদি ভাবেন সেই পার্টি নেই—তবে সেই পার্টি গড়ে তোলার তাকে নিবেদিত হতে হবে। এটা বোঝা দরকার, জনগনের সামনে তুলে ধরাও দরকার।

ইশতেহার প্রকাশকরা দাবী করেছেন যে, "রাজনৈতিক দলের সমালোচনা হঠাৎ নতুন কিংবা ইশতেহার পত্রিকার একক পুঁজি নয়!" এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি দিয়েছেন দু'টি। একটি তাদের সাধারণ সম্পাদকের ১৯৭৯-৮১ সনের রিপোর্ট—যে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতেও তাদের সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন; অপরটি ছাত্রলীগের (ফ-চু) জাতীয় সম্মেলন '৮৩তে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী। তাদের এই উপলব্ধি দুই বছর আগের সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা যাই বলুন—কিন্তু তারপরও তারা তাদের সঠিক রাজনৈতিক লাইনে জাসদকে টেনে আনতে পারেন নি আবার জাসদের প্রতি সমর্থনও ফিরিয়ে নেন। বিষয়টির অর্থহীনতা সহজেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতি আরো বিস্ময়কর, বলা হয়েছে "জাতীয় রাজনীতির প্রগতিশীল ধারা আজ দারুণ সংকটে নিপতিত। সুবিধাবাদী নেতৃত্বের আপোষকামীতায় মোটা উৎকোচ গ্রহণের বিনিময়ে বিকিয়ে দিচ্ছে অনেকেই তাদের চরিত্র।" লক্ষ্য করুন যে নেতৃত্ব সুবিধাবাদী, আপোষকামী ও মোটা উৎকোচের বিনিময়ে বিক্রি হয় তাকেই আবার বলা হচ্ছে 'প্রগতিশীল।' সোনার পাথর বাটি, অমাবস্যার চাঁদ, ডুমুরের ফুল যেমন অসম্ভব তারও চেয়ে অসম্ভব সুবিধাবাদী, আপোষকামী আত্মবিক্রীত নেতৃত্বের প্রগতিশীল হয়ে ওঠা। ঐ আশায় যদি কোনো রাজনৈতিক কর্মী বসে থাকেন তবে তার জন্যে করুণা করা ছাড়া আর কি-ই বা করা যেতে পারে?

ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক দলগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো কিনা এ নিয়ে ইশতেহার প্রশ্ন তুলেছে। মানতেই হবে এ প্রশ্ন তাদের পক্ষেই তোলা সঙ্গত। কেননা এরা রাজনৈতিক দলকে জুজুর মতো ভয় পান।

১৪।১৫ই ফেব্রুয়ারী পর ১৫ দল থমকে দাঁড়িয়েছিলো কেনো তার মূল্যায়ণ করতে হবে আবেগ দিয়ে নয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আমাদেরকে তা খুঁজতে হবে ১৫ দলের ঐক্যের ভিত্তির মধ্যে। ১৫ দল তখন পর্যন্ত ইস্যুভিত্তিক ঐক্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে তখন পর্যন্ত জোটের কোনো দিক-নির্দেশনা ছিলো না—আর সে কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিলো। যদি ন্যূনতম হলেও কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যজোট গঠিত হতো তার আরো খানিকটা এগুনো যেতো। এই আপাতঃ ব্যর্থতার আশংকা ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আগেও বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে, তা সত্বেও তারাও কর্মসূচীর জোর ভিত্তির ওপর নিজেদের দাঁড় করাতে পারেন নি। ইশতেহারের মূল্যায়নে এই দিক অনুপস্থিত। আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা ও সীমাবদ্ধতার কারণেই এটা তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। বরং আবেগের প্রাবল্যে তারা ১১ই জানুয়ারী 'নেতৃত্বের নিষেধ অমান্য'কে পর্যন্ত পরোক্ষ বাহাবা দিয়েছেন। সেটা পেয়েছেন কেননা ভূত তো সর্ষের ভেতরের ত্রুটি দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা তখনও বলেছি, এখনও মনে করি, ১১ই জানুয়ারীতে যারা বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছেন তারা আন্দোলন ও নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির পার্থক্য হয় বোঝেন না নতুবা আন্দোলনকে নৈরাজ্যে দিকে ঠেলে দিতে চান।

নিবন্ধের 'কিভাবে এগোব?' উপাংশে আন্দোলনের ভবিষ্যত দিক-নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে: "যদি জনগণের গণতন্ত্র অর্জন করতে হয় এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে অবশ্যই সংগ্রামকে আপোষহীন ধারায় এগিয়ে নিতে হবে।" আরো বলা হয়েছে: "গণতন্ত্রের সংগ্রামকে আপোষহীন ধারায় এগিয়ে নিতে গিয়েই জনগণ দেখতে পাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রধারীরা মাঝপথে ডিগবাজী খাচ্ছে।" এতটুকু পর্যন্ত অবশ্যই তারা ঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু তারপরে তারা বলছেন, 'জনগণ এ থেকে শিক্ষা নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার প্রতিনিধিত্বকারী শক্তির নেতৃত্বে বাকী পথটা অতিক্রম করবে ও সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের পথে অনেকখানি এগোতে পারবে।" ইশতেহার প্রকাশকরা যদি সত্যি সত্যি

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হন ও সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন করতে চান তবে তাদের স্বীকার করতেই হবে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিই হতে পারে। সে কথাটাই বলা দরকার যে, আন্দোলনকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছুতে হলে তার নেতৃত্ব দিতে হবে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টিকে। ইশতেহার প্রকাশকরা সর্বহারা শ্রেণীর এই পার্টি গঠন ও তাদের পেছনে সারিবদ্ধ হওয়ার প্রশ্নটিই এড়িয়ে যেতে চান।

কিন্তু এখানে পাঠকরা প্রশ্ন করতে পারেন তবে কি যতদিন পর্যন্ত সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার মতো শক্তিশালী না হবে ততদিন আমরা বসে থাকবো?—না, তা নয়—আমরা তা বলি না। আমরা ততদিন পর্যন্ত জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন রচনায় সমাজ-পরিবর্তনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী বাম দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন রচনায় বিশ্বাসী। কিন্তু ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জনগণের কাছে, সর্বহারা শ্রেণীর কাছে এটা স্পষ্ট করে তুলতে হবে যে, এই আন্দোলনকে তার চূড়ান্ত শোষন মুক্তির লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে একটি মাত্র দল—যে দল শ্রমিক, কৃষকের—সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি। বাম-পন্থী দলের এই কর্মসূচীগত ঐক্য মোর্চা গড়বার সাথে সাথে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্যে বৃহত্তর ঐক্য মোর্চা গড়ে উঠতে পারে—তাতে বুর্জোয়া দলও হয়তো জায়গা পাবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কর্মসূচীর ভিত্তিতে। আর ঐক্য মোর্চার কর্ম-সূচীতে যতদূর সম্ভব সন্নিবেশিত করতে হবে সমাজ কাঠামোর কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয় সমূহকে। আন্দোলনকে এই ভাবেই পর্যায়ক্রমিকভাবে এগিয়ে নেয়া দরকার—এর বিকল্প মানেই আন্দোলনে ফাঁক রেখে দেয়া, সেই ফাঁক আন্দোলনকে সামরিকভাবে ব্যর্থ, চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত এবং পদে পদে বিপথগামী করতে পারে।

ফোরামের মূল্যায়ন:

ছাত্র ঐক্য ফোরামের মুখপত্র 'ফোরামে' (২৫ নং বুলেটিন) আন্দো-

লনের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের পাশাপাশি ১১ই জানুয়ারীর ঘটনার মূল্যায়ন পেশ করা হয়েছে। গোড়াতে বলে নেয়া ভালো বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীনদের চরিত্র বিষয়ে এদের সাথে আমাদের একটি মৌলিক মত পার্থক্য রয়েছে তা সত্ত্বেও ফোরামের এই বক্তব্য অনেক দূর বাস্তব সম্মত যে "শুধুমাত্র ছাত্র আন্দোলন দিয়েই সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থাৎ সামরিকতন্ত্রের উৎখাত সাধন করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ে এ কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারী শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী—তার সবচেয়ে কাছের মিত্র হচ্ছে ভূমিহীন কৃষক, এ ছাড়া গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষক সহ ব্যাপক বিত্তহীন সাধারণ মানুষ শ্রমিক শ্রেণীর কাঁধে কাধ মিলিয়ে লড়বে। লক্ষ্যণীয় যে আমাদের আন্দোলন শ্রমিক কৃষক সহ সকল স্তরের নিপীড়িত শ্রেণীগুলোকে তাদের নিজ নিজ দাবীদাওয়া, বিক্ষোভ ও বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ নিয়ে সামনে এগিয়ে আসার পথ করে দিয়েছে। শ্রমিক ও তার মিত্র শ্রেণীকে তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে জন্যে যেভাবে সচেতন হয়ে ওঠা প্রয়োজন সে সচেতন সংঘবদ্ধতার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলন গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে।"

ফোরাম মধ্য-ফেব্রুয়ারীতে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতির সঠিক দিক-নির্দেশনা খুঁজে নিতে গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ১৫ দল 'সময় মতো যথোপযুক্ত সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গণতন্ত্র-প্রত্যাশী মানুষের আস্থা অর্জন করতে বেগ পাচ্ছে।' কিন্তু অবাক হবার বিষয় এই যে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময় এটা ফোরাম কর্মীরা ভুলে যাচ্ছেন যে, ১৫ দলীয় ঐক্য মোর্চার ভিত্তি ও কাঠামোই এর আন্দোলনের রূপ (form) নির্ধারন করছে, তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সেই ফর্মের বাইরে যেতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে কোন প্রবাদ থেকে কে কি শিক্ষা নিলেন সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। আমি আগেও বলেছি, মধ্য-ফেব্রুয়ারীর ঘটনা পর্যন্ত

১৫ দল যে ফর্মের আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই প্রস্তুতিতে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্তে তারা আসতে পারতেন না। কোনো দলের ইচ্ছে-অনিচ্ছে দিয়ে জোটের আন্দোলনের ফর্ম নির্ধারিত হয় না। কেননা ১১ই জানুয়ারীর ঘটনার মূল্যায়নে তারা জানিয়েছেন যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের কর্মসূচী পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নিলে ফোরাম তাতে একমত ছিলেন না, note of dissent তারা দিয়েছিলেন। পরিষদ কি তাতে পিছিয়ে এসেছে? না আসে নি, সিদ্ধান্ত পাল্টেছেন—কেননা আমি আগেও বলেছি এর কোনো বিকল্প পরিষদের হাতে ছিলো না।

ফোরাম ১১ই জানুয়ারীর কর্মসূচীর পরিবর্তনকে "আন্দোলনে আপোষকামী ও আন্দোলন বিরোধী শক্তির সাময়িক বিজয়" বলে মনে করেন। তাদের ধারণায় ১১ই জানুয়ারী "মিছিল না হলে ছাত্র সমাজের ইজ্জত মাঠে মারা যেত দেশ ও দুনিয়ার সামনে। ভাটা পড়তো কর্মীদের জঙ্গী মনোভাবে। সেই সুযোগে বাজ সেনাপতিরা নিপীড়নে সাহস পেয়ে যেত। অথবা ঘু ঘু সেনাপতিরা মওকা পেত আরো বিভ্রান্তি সৃষ্টির।" এই মতের সাথে একমত হবার কোনো কারণই নেই। কেননা ১১ই জানুয়ারীর ঘটনার মধ্যে দিয়ে আন্দোলন বিরোধী শক্তি যদি বিজয়ীই হতো তবে পরিষদের অস্তিত্ব আর টেকার কথা নয়—১৪ই ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী বাস্তবায়নতো দূরের কথা। পরিষদের অভ্যন্তরে অধিকাংশ শরীকই যদি আন্দোলন বিরোধী শক্তি হয়ে দাঁড়ায় তবে তার তো আর এগুবার কথা নয়।

ফোরামে এ ঘটনায় ইজ্জত নাশের যে আবেগী বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা বিস্ময়কর এই কারণে যে বিভেদের উজ্জ্বল উদাহরণ সবার সামনে খাড়া করলে তাতে ইজ্জত বাড়ে না। আর নেতৃত্বহীন জঙ্গী মনোভাবের স্বতঃস্ফূর্ততা আন্দোলনের মূল শক্তি বলে কখনোই পরিগণিত হতে পারেনা। স্বতঃস্ফূর্ততা যদি কোনো আন্দোলনের প্রাণশক্তি হয় তবে সে আন্দোলন নৈরাজ্যিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হতে পারে বলে আমরা মনে করিনা। এই প্রবণতাকে নৈরাজ্যবাদী ও হঠকারী বলার বিরুদ্ধে

ফোরাম ঘোর আপত্তি দিয়েছে কেননা "এই মিছিল ছিল ছাত্র সমাজের আপোষহীন জংগী চেতনার প্রতিনিধি।" কিন্তু এ কথা ভুললে তো চলবে না যে, অধিকাংশ ছাত্রের আন্দোলনমুখী চেতনা ও নিষ্পাপ আবেগকে অপরিণত ছাত্র আন্দোলনের আকারে সংঘর্ষে ঠেলে দিলেই কোনো দাবী আদায় হয়না—আর যে আন্দোলনকে আরো বহু দূর পথ এগুতে হবে তাকে তো কেবলই এই আবেগের স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়। আন্দোলনের ওপর যদি পূর্ণ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত না হয় ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন না থাকে তবে তার পরিণতিও বাঞ্ছিত রূপ নেবে না। ফোরাম যদি এটা সত্যি মনে করে যে এই আন্দোলন 'সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলনের অংশ' তবে তাদের ১১ই জানুয়ারীর প্রস্তুতিবিহীন এ্যাকশনমুখী কর্মসূচীকে এতোটা প্রাধান্য দেয়া অনুচিত। ফোরামের জুন-জুলাই সংখ্যায় ভবিষ্যত আন্দোলনের পদ্ধতির প্রশ্নে এই মত দেয়া হয়েছে যে "আন্দোলনকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে যৌথ সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।" তারা এই রায় দিয়েছেন যে, 'এর বিরোধিতা যদি কেউ করেন তবে তিনি আন্দোলনের মিত্র নন এবং এর প্রয়োজনীয়তা এখনো যারা উপলব্ধি করতে পারছেন না তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করা যায় না।" এই কথাগুলো ভাববার মতো। ফোরাম তাদের প্রস্তাবিত 'যৌথ সংগ্রাম পরিষদের প্রয়োজনীয়তার কোনো বিশদ ব্যাখ্যা দেননি। তবে ধারণা করি, আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিশেষতঃ মেহনতী মানুষের, সম্পৃক্তি বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য। যদি তাই হয় তবে বরং আন্দোলনের দূর লক্ষ্যকে সামনে রেখে আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি-প্রত্যাশী রাজনৈতিক দল সমূহের মোর্চার কর্মসূচী এবং পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলনকে জোরদার করা হবে তার শ্রেষ্ঠ পথ। সে ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা বরফ-ভাঙ্গার, শ্রমিক ও মিত্র শ্রেণীর সংঘবদ্ধতার চেতনার উন্মেষ ঘটানোর এবং সেই আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার। তার চেয়ে বেশী কি ছাত্র সমাজ করতে

পারবে? এমনকি যদি তারা যৌথ সংগ্রাম পরিষদভুক্ত হয় তবেও কি এরা নিজস্ব ঐতিহাসিক ও শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা উৎরে অন্য শ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হবে? না হতে পারে। মূল কাজের ওপর জোর দেয়াই হচ্ছে সময়োচিত তৎপরতা—ঐক্যের ভিত্তি যদি দুর্বল হয় এবং তাতে ফাঁক থাকে তবে আন্দোলনে কি ভূমিকা পালন করা সম্ভব ১৫ দলীয় জোট তার প্রমাণ।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল্যায়ন ঃ

১৫ই জুলাই তারিখের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বিতীয় সংখ্যায় সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমরের ২৩শে জুনে লেখা নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। জনাব উমর পুরো ছাত্র আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়া উল্লেখ করা মতো অন্য কোনো বৈশিষ্ট খুঁজে পাননি। তাঁর ধারণা বিদ্যমান সমস্যা সমূহের মোকাবেলার জন্যে অন্তর্নিহিত তাগিদ ও সেই পরিবর্তন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সুসংগঠিত শক্তির অনুপস্থিতির কারণেই এই আন্দোলন জন্ম নিয়েছে ক্ষেত্রে ও বিকশিত হয়েছে।

এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, যে কোনো আন্দোলনেই স্বতঃস্ফূর্ততার একটি দিক থাকে—কিন্তু আন্দোলনে সেটিই প্রধান দিক কিনা তা নির্ধারিত হয় আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে, সংগঠিত আকারে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগুচ্ছে কিনা তার উপরে। যদি এই তিনই থাকে অনুপস্থিত তবে বুঝতে হবে স্বতঃস্ফূর্ততা আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়েছে। জনাব উমর মনে করেন, বর্তমান ছাত্র আন্দোলনে এই তিন-এর অনুপস্থিতি প্রবল এবং তাতে করে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার দিকই মুখ্য। আমাদের ধারণা গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশে সমাজ পরিবর্তনের ভাবাদর্শগত জমিন তৈরীতে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিষয়গত প্রস্তুতিতে এই আন্দোলনের ভূমিকা রয়েছে। ফলে দূর-লক্ষ্যাভিসারী এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততাকে মুখ্য মনে করার পেছনের যুক্তিটি দুর্বল বলেই আমাদের ধারনা।

যে কোনো আন্দোলন গড়েওঠার শর্ত তার সামাজিক বাস্তবতার ভেতরেই নিহিত থাকে। আর এই শর্ত যে সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত তাগিদ

এ নিয়েও বিতর্কের অবকাশ নেই। প্রশ্ন কেবল এই যে, তা কাঠামোগত পরিবর্তনের তাগিদ কিনা। আজকের দিনে নিঃসন্দেহে সেই তাগিদ কাঠামোগত পরিবর্তনেরই তাগিদ। জনাব উমর মনে করছেন পরিবর্তন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো সুসংগঠিত শক্তির অনুপস্থিতিই এই আন্দোলনের উৎস শক্তি। আমরা তা মনে করিনা। আমাদের ধারণায় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করে এবং তা কার্যকর করতে সক্রিয় এমন শক্তি যদি দুর্বল হয় তবে তাকে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়—শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। পরিবর্তনকাঙ্ক্ষী বিচ্ছিন্ন জনতাকে সংগঠিত করা ও ব্যাপকতর মানুষকে এই আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রেও এই আন্দোলনের একটি ভূমিকা নিঃসন্দেহে রয়েছে।

জনাব উমরের সাথে আমি এ ব্যাপারে একমত যে "আমাদের সমাজে একটি মৌলিক পরিবর্তনের তাগিদ আজ গভীর ও ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে এবং এই পরিবর্তন সাধনের অর্থ শ্রমিক কৃষকের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধন। একথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার এ জন্য যে, এর উপলব্ধির মাধ্যম আমরা শুধু পরিবর্তনের লক্ষ্যগুলিই যে শুধু সঠিকভাকে নির্দিষ্ট করতে পারবো তাই নয়, যে পদ্ধতি ও কর্মধারার মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্ভব সেই পদ্ধতি ও কর্মধারা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবর্তন ও শক্তিশালী করার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি ও কর্মশক্তি নিবদ্ধ এবং নিযুক্ত রাখতে পারবো।

যেহেতু মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন শ্রমিক কৃষকের জীবনের মৌলিক পরিবর্তন সেজন্য এ পরিবর্তনের সংগ্রামে শ্রমিক কৃষককে সচেতনভাবে ও সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। এবং যেহেতু এই পরিবর্তনের সংগ্রাম হলো পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম সেজন্য শ্রমিক কৃষককে এই সংগ্রামে রাজনৈতিকভাবেই অংশ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এখানেও শেষ নয়। যেহেতু কোন সঠিক রাজনৈতিক সংগ্রামই উপযুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত সম্ভব নয় সেজন্য এই মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার অবশ্যই হতে হবে শ্রমিক কৃষকের একটি রাজনৈতিক দলকে।

সামগ্রিক সংগ্রামের এই পরিপ্রেক্ষিত যদি আমরা লাভ করি তাহলে একথা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজেই সম্ভব হবে যে, বর্তমানে ছাত্র

রাজনীতির মাধ্যমে পরিবর্তনের তাগিদ যত মূর্ত রূপ লাভ করুক শুধু তার দ্বারাই কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। এবং যদি উপরোক্ত রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতিতে ছাত্র সংগ্রাম যুগ যুগ ধরে জারী থাকে তাহলেও তার দ্বারা বিদ্যমান পরিস্থিতি মৌলিকভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।"

জনাব উমরের সাথে এতদূর ঐকমত্য সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমরা কোনোভাবেই একমত হতে পারিনা যে, "ছাত্র আন্দোলনকে সঠিকভাবে খর্ব না করে বাঙলাদেশে সমাজ পরিবর্তনের কোনো সংগ্রাম গভীর ও ব্যাপকভাবে সংগঠিত হতে পারেনা।" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের এই আন্দোলন ও তার নেতৃত্ব যদি সঠিক সমাজ পরিবর্তনকামী শক্তির হাতে রাখা যায় তবে তার ভেতর দিয়েই ব্যাপক জনগণের শাসনে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের ধারণাকে মূর্ত করে তোলা যাবে এবং জনগণের চিন্তা চেতনার ভেতরে বর্তমান বুর্জোয়া পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতির বিকল্প শক্তি হিসেবে তা আবির্ভূত হবে। সেই কারণেই জনাব উমরের 'আন্দোলন-খর্ব-তত্ত্ব' ইতিবাচক বা নেতিবাচক দাঁড় যেই ব্যাখ্যার ওপরেই বরানো হোক নাকেনো এক ধরনের সীমাবদ্ধ চিন্তার ফসল বলেই আমাদের ধারণা।

ইশতেহারের (২রা অক্টোবর সংখ্যা) মূল্যায়ন ঃ

ইশতেহারের সর্বশেষ এই সংখ্যায়ও তাদের পূর্বের বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উপরন্তু এবার রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনায় 'ডান-বাম নির্বিশেষে' সবাইকেই আপোষকামীতায় অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা আগেই আমাদের বক্তব্য বলেছি। তাদের সেই পুরোনো ঢংয়ে 'জনতার নিজস্ব শক্তি' 'মাঠের আন্দোলন' প্রভৃতি বাক্যবন্ধ যে বিষয়টি প্রমাণ করেছে তা হলো আবেগের প্রাবল্যে এরা সুস্থির চিন্তারও অবকাশ পাচ্ছে না। এরা এবার 'ছাত্র আন্দোলনকে

রাজপথের দখল নেবার' উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইতিমধ্যেই তারা আগামী দিনের আন্দোলনে ছাত্ররাই বিকল্প নেতৃত্ব বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এ যে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসীদের কাছে নেহাৎই বালখিল্যতা এ তো সবাই বোঝেন, আলোচনায় দীর্ঘসূত্রিতা কেবলই বাক্যব্যয়।

[চার]

উপসংহার

আন্দোলনের ধারাক্রমের বিশ্লেষণ ও বিভিন্নমুখী মূল্যায়ণের সমালোচনার পাশাপাশি আমরা ছাত্র আন্দোলনের এবং এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি আশংকার দিকেই অঙ্গুলী সংকেত করতে চেয়েছি। এ কথা পরিষদ নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র কর্মীদের এখনই বোঝা দরকার যে, আগামী দিনগুলোতে আন্দোলনকে যে রূপের আন্দোলেন নিয়ে যাবার জন্যে ভেতরে ও বাইরে থেকে প্রয়াস চলছে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য কি সমাজ-পরিবর্তনকামী আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি বিধান, নাকি ভিন্ন কিছু? যে বিষয়গত প্রস্তুতি ছাড়া আন্দোলনকে জঙ্গী করে তুললে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির সূচনা হয় আমরা সে প্রস্তুতি সম্পাদনে সক্ষম হয়েছি কিনা তা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততা আন্দোলনকে অনেকদূর এগোয় বৈকি, কিন্তু যৌক্তিক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় না। ছাত্র আন্দোলনের সেই স্বতঃস্ফূর্ততার প্রাধান্য পর্ব আমরা অতিক্রম করে এসেছি বটে কিন্তু তা যে আবারও ফিরে আসতে পারেনা তা ঠিক নয়। নেতৃত্বের কাজই হচ্ছে সেই আশংকা ঠেকিয়ে রাখা। তদুপরি জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে রাজনৈতিক দলের ঐক্য মোর্চার ভিত্তিতে এ ধরণের ঢিলেঢালা ভাব বজায় রেখে এই আন্দোলনকে দরকষাকষির আন্দোলনে রূপান্তর থেকে বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর ক্ষমতাসীন কি ক্ষমতা বহির্ভূত—মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সমূহ সুযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভিন্ন পথ বেছে নিলে তা হবে এতদিনকার আন্দোলনের সুফলকেই ধূলায় মিশিয়ে দেয়া। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের লড়াইকেও যে তার সীমার মধ্যে থেকে বিপ্লবী গণতন্ত্রের আন্দোলনে রূপান্তরের জন্যে ক্রমাগত প্রয়াস চালাতে হয় এ কথা আমাদের এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা দরকার। আন্দোলনের আগামী দিনগুলোতে ছাত্র কর্মীদেরকে তাই তার সমগ্র সচেতনতা দিয়ে বাস্তবমুখী কর্মসূচীর জন্যে নেতৃত্বকে Guard দিতে হবে। আর সেটাই হবে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা রুখবার পথ।